বাংলাদেশের শ্রম সস্তা, তাই বলে কতটা?

প্রভাষ আমিন

বাংলাদেশের অর্থনীতি দাঁড়িয়ে আছে ইংরেজি বর্ণমালার তিন 'আর'-এর ওপর - রাইস, রেমিটেন্স, রেডিমেড গার্মেন্টস। রাইস বা ধান আমাদের আবহমান কালের ঐতিহ্য। কৃষকরা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে ধান ফলান বলেই আমরা ১৮ কোটি মানুষ খেয়েপরে বেঁচে আছি। বাংলাদেশের জমি উর্বর। একসময় যেখানে বছরে একবার ফসল হতো, এখন সেখানে তিনবার হয়। কৃষি বিজ্ঞানীদের নানান গবেষণায় ধানের উৎপাদন বেড়েছে। তাই জনসংখ্যা পাল্লা দিয়ে বাড়লেও পাতে খাবারে টান পড়েনি। কৃষকরা আমাদের খাবার জোগালেও আমরা তাদের কোনো মর্যাদাই দেই না। আমাদের সুশীল সমাজের কোনো আলোচনায় কৃষকরা ঠাঁই পান না। গণমাধ্যমে তাদের কথা উঠে আসে না। মৌসুমে ধানের দাম কমে গেলে আমরা হালকা আওয়াজ তুলি, কিন্তু তাতেও তারা ন্যায্যমূল্য পান না।

বাংলাদেশের অন্তত দেড় কোটি মানুষ বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছেন। তবে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বাংলাদেশিদের মধ্যে দুই ধরনের মানুষ আছেন। বড় অংশটি বিদেশে যান নিজের ও পরিবারের ভাগ্য বদলাতে। তারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে উপার্জিত অর্থ দেশে পাঠান। তাদের পাঠানো অর্থ মানে রেমিটেন্সে ফুলে ফেঁপে ওঠে আমাদের রিজার্ভ। এই প্রবাসী শ্রমিকরা নিজেরা খেয়ে না খেয়ে থাকেন উন্নত ভবিষ্যতের আশায়। প্রবাসী শ্রমিকদের বেশিরভাগ থাকেন মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে। তবে বিশ্বের হেন কোনো দেশ নেই, যেখানে বাংলাদেশের মানুষ মিলবে না। অনেকে নানা ঝুঁকি নিয়ে ইউরোপ-আমেরিকা যান। কিন্তু অনেকে উন্নত বিশ্বে থেকেও উন্নতির ছায়াও দেখেন না। তারা কঠোর পরিশ্রমের কাজ করেন। বাসায় ফিরে বেঘোরে ঘুমান, আবার কাজে যান। এই তাদের রুটিন। আরেক ধরনের প্রবাসী আছেন। যারা দেশে সর্বোচ্চ সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার পরও আরো নিশ্চিন্তির আশায় বিদেশে যান। তবে তারা কোনো রেমিটেন্স পাঠান না। বরং দেশের সম্পদ বিক্রি করে বিদেশে সম্পদ গড়েন। অনেকে অবৈধ উপায়ে অর্জিত অর্থ পাচার করে বিদেশে আয়েশী জীবনযাপন করেন। এই দ্বিতীয় ঘরানার প্রবাসীরা আসলে দেশের শত্রু। কিন্তু তারা কালেভদ্রে দেশে আসা-যাওয়ার সময় বিমাবন্দরে ভিআইপি মর্যাদা পান। আর মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যারা রেমিটেন্স পাঠান বিমানবন্দরে, অ্যাম্বাসিতে তাদের সাথে কুকুর-বিড়ালের মতো আচরণ করা হয়।

রাইস উৎপাদনকারী কৃষক আর রেমিটেন্স আনা শ্রমিক - দুইই আমাদের কাছে অবহেলার মানুষ। তাদের প্রতি আমাদের কোনো মায়া নেই, দরদ নেই, ভালোবাসা নেই। পদে পদে শুধু অবহেলাই তাদের প্রাপ্য।

রইলো বাকি রেডিমেড গার্মেন্টস, মানে তৈরি পোশাক। এই তৈরি পোশাক খাতই এখন বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রাণভোমরা। বলতে গেলে বাংলাদেশ দাঁড়িয়ে আছে তৈরি পোশাক খাতের ওপর। তবে এই দাঁড়িয়ে থাকাটা আরো শক্ত ভিতের ওপর হতে পারতো। বাংলাদেশের তৈরি পোশাক খাত আসলে আধুনিক দর্জিগিরি। বিদেশ থেকে কাপড় এনে সেলাই করে আবার তা রপ্তানি করি। আমাদের কাজ শুধু সেলাই করা। একবার ভাবুন, পুরো বিষয়টায় যদি আমরাই মূল উৎপাদক হতে পারতাম, অর্থনীতি কোথায় চলে যেতো। অনেকে বলতে পারেন, এতো দেশ থাকতে বাংলাদেশেই কেন তৈরি পোশাক খাতের এত বিকাশ। আসলে একটাই কারণ - সস্তা শ্রম। বাংলাদেশে মানুষ বেশি তাই কম পয়সায় শ্রমিক পাওয়া যায়। তাই বাংলাদেশ থেকে পোশাক নেওয়ার ব্যাপারে বিদেশিদের এতো আগ্রহ। বাংলাদেশে শ্রম সস্তা, তবে সেটা কতটা সস্তা, কতটাইবা হওয়া উচিত? এ প্রসঙ্গে পরে আসছি।

তৈরি পোশাক খাত বাংলাদেশের অর্থনীতির দিগন্ত বদলে দিয়েছে। শুধু অর্থনীতি নয়, গার্মেন্টস শিল্প আসলে বাংলাদেশের সমাজের গঠনটাই বদলে দিয়েছে। নারীর ক্ষমতায়ন নিয়ে অনেকেই অনেক কথা বলেন। তবে নারীর ক্ষমতায়নের আসল কাজটা করেছে গার্মেন্টস শিল্প। ক্ষমতায়ন মানে কিন্তু অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়া। ধর্মীয় মৌলবাদীদের নানা বাধা সত্ত্বেও বাংলাদেশের নারীরা কিন্তু এখন আর অবরোধবাসিনী নয়। তারা বেরিয়ে এসেছে। পুরুষদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করছে। নারীর কাজ, পুরুষের কাজ বলে এখন আলাদা কিছু নেই। এই নারী জাগরণের নেতৃত্ব দিয়েছে আমাদের গার্মেন্টস শ্রমিকরা। আগেও তারা গৃহস্থালী কাজ করতো। কিন্তু তার কোনো আর্থিক বা সামাজিক স্বীকৃতি ছিল না। গার্মেন্টস শিল্প নারীদের সেই স্বীকৃতি দিয়েছে। গার্মেন্টস শিল্প এলাকায় ভোরে যখন নারীরা দল বেধে কাজে যান, মনে হয় বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে।

সস্তা শ্রম দিয়ে বাংলাদেশে গার্মেন্টস খাত বিকশিত হয়েছে, নারীর ক্ষমতায়ন হয়েছে, দেশের অর্থনীতি এগিয়েছে। সব ঠিক আছে। কিন্তু শোষণ আর কতদিন করবেন। এখন তো সময় এসেছে, গার্মেন্টস খাতের টেকসই বিকাশের। শুধু সস্তা শ্রমে, কাপড় সেলাই করে আর কতদিন চলবে। বাংলাদেশে এক প্রজন্মে বড়লোক হওয়ার খাত দুটি - আবাসন ব্যবসার

নামে মানুষের জমি দখল আর গার্মেন্টস ব্যবসা। চোখের সামনে গার্মেন্টস ব্যবসা করে অনেককে আঙুল ফুলে কলাগাছ হতে দেখেছি। শ্রমিকদের দাবি-দাওয়া সামনে এলেই গার্মেন্টস মালিকরা গলা শুকান। এই সমস্যা, সেই সমস্যার কথা বলেন। কিন্তু বাস্তবে দেখবেন বছর বছর তারা গাড়ি বদলান, বাড়ি বদলান। মালিকদের ভাগ্য বদলালেও শ্রমিকদের জীবনমান যেই তিমিরে সেই তিমিরেই থাকে। সরকারের কাছ থেকে গার্মেন্টস মালিকরা নানান সুবিধা আদায় করেন। যেহেতু গার্মেন্টস শিল্পের ওপর অর্থনীতির বড় নির্ভরতা। তাই সরকার তাদের কথা ফেলতে পারেন না। কিন্তু আন্দোলন ছাড়া শ্রমিকদের দাবি আদায় হয় না।

পাঁচ বছর পর পর গার্মেন্টস শ্রমিকদের মজুরি পুনর্নির্ধারণ করার কথা। সময় এলেই মালিকরা নানান বাহানা করেন। শ্রমিকরা আন্দোলন করেন। অনেকে জীবন দেন। কিন্তু জীবন দিয়েও জীবন বদলাতে পারেন না। এবার যখন মজুরি পুনর্নির্ধারণের প্রশ্ন আসলো তখন মালিকপক্ষ প্রস্তাব করেছিল সর্বনিম্ন মজুরি ১০ হাজার ৪০০ টাকা করার। শ্রমিকদের প্রস্তাব ছিল ২০ হাজার ৩৯৩ টাকা। শেষ পর্যন্ত ন্যূনতম মজুরি ১২ হাজার ৫০০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। গত ৮ নভেম্বর শ্রম প্রতিমন্ত্রী মুন্নুজান সুফিয়ান এই নতুন মজুরি কাঠামো ঘোষণা করেন। সেখানে ন্যূনতম মজুরি বোর্ডের চেয়ারম্যান লিয়াকত আলী মোল্লা, বিজিএমইএর সভাপতি ফারুক হাসান, বিকেএমইএর সভাপতি একেএম সেলিম ওসমান, বিজিএমইএর সাবেক সভাপতি শফিউল ইসলাম মহিউদ্দিন, মজুরি বোর্ডে মালিকপক্ষের প্রতিনিধি সিদ্দিকুর রহমান, শ্রমিকপক্ষের প্রতিনিধি সিরাজুল ইসলাম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। ১ ডিসেম্বর থেকে এই মজুরি কাঠামো কার্যকর হওয়ার কথা। তবে শ্রমিকদের একটি অংশ এই কাঠামো প্রত্যাখ্যান করেছিল। আগের তুলনায় ন্যূনতম মজুরি বেড়েছে ৫৬ শতাংশ। ২০১৮ সালে সর্বশেষ গার্মেন্টস শ্রমিকদের মজুরি নির্ধারণ করা হয়েছিল ৮ হাজার টাকা। ১৯৯৬ সালে ন্যূনতম মজুরি ছিল ৯৩০ টাকা, ২০০৬ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ১ হাজার ৬৬২ টাকা। ২০১০ সালে সর্বনিম্ন মজুরি ছিল ৩ হাজার টাকা, ২০১৩ সালে ছিল ৫ হাজার ৩০০ টাকা।

২০১৮ সালের তুলনায় ৫৬ শতাংশ মজুরি বেড়েছে, শুনতে খুব ভালো শোনায়। কিন্তু বাজারের অবস্থা, মূল্যস্ফীতি বিবেচনায় নিলে মাসে ১২ হাজার ৫০০ টাকা অপ্রতুল। এই টাকায় বাংলাদেশে এখন একজন মানুষেরই বেঁচে থাকা কঠিন। একটা কথা ঠিক, বাংলাদেশের অনেক সিদ্ধান্তই এখন আমরা নিতে পারি না। ক্রেতাদের চাপে বাধ্য হয়ে অনেক সিদ্ধান্ত নিতে হয়। কখনো কখনো তা ভালোও হয়। রানা প্লাজা ধ্বসের পর ক্রেতাদের চাপে আমাদের গার্মেন্টস খাতের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হয়েছে। এ ধরনের চাপ ভালো। তবে চাপের সাথে তারা যদি দামও একটু বাড়ানো হতো, তাহলে শ্রমিকদের

মজুরি আরো বেশি বাড়ানো যেতো। সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও নতুন এক পোশাক নীতি প্রণয়ন করেছে। এ নীতি অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্র বিভিন্ন দেশের সরকার, শ্রমিক, শ্রমিক সংগঠন, সুশীল সমাজ ও বেসরকারি খাতকে সম্পৃক্ত করে শ্রমিক অধিকার সুরক্ষায় কাজ করবে। এই নীতি ঘোষণার সময় এক বিবৃতিতে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন, যারা শ্রমিকদের অধিকারের বিরুদ্ধে কাজ করবেন, হুমকি দেবেন, ভয় দেখাবেন, তাদের ওপর প্রয়োজনে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এখন শ্রমিকদের অধিকার রক্ষায় কাজ করছে, এটা খুব ভালো। কিন্তু তারা যদি পোশাকের দামও অল্প বাড়াতো, তাহলে শ্রমিকরা আরো বেশি মজুরি পেতো, তাদের আর আন্দোলন করতে হতো না।

গার্মেন্টস শ্রমিকরা ন্যায্য মজুরি ও দাবি আদায়ে আন্দোলন করতেই পারে। এ অধিকার তাদের আছে। কিন্তু আন্দোলনের নামে ভাংচুর, অগ্নিসংযোগ, ধর্মঘট করলে তা আসলে নিজের পায়ে কুড়াল মারার মতোই। বাংলাদেশের গার্মেন্টস শিল্পকে কিন্তু কঠিন প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে টিকে থাকতে হয়। গার্মেন্টস শিল্পে অস্থিরতা বা দাম একটু এদিক-সেদিক হলেই কিন্তু সুযোগ নেওয়ার জন্য ভিয়েতনাম বসে থাকবে। তাই আমাদের আন্দোলন করতে হবে, জাতীয় স্বার্থ রক্ষা করেই। অন্য রাজনৈতিক আন্দোলন আর গার্মেন্টস শ্রমিকদের আন্দোলন কিন্তু এক নয়। অন্য আন্দোলনে ক্ষতি হয় অভ্যন্তরীণ। আর গার্মেন্টস খাতে ঝুঁকি কিন্তু আন্তর্জাতিক।

বর্তমান বাজার, মূল্যস্ফীতি বিবেচনায় গার্মেন্টস শ্রমিকদের মজুরি পর্যাপ্ত নয়। কিন্তু গার্মেন্টস শ্রমিকদের মজুরি কাঠামো নিয়ে একটা ভুল ধারণা প্রচলিত আছে। মনে করা হয়, সব গার্মেন্টস শ্রমিকের মজুরিই বুঝি ১২ হাজার ৫০০ টাকা। তা নয় কিন্তু ১২ হাজার ৫০০ টাকা হলো ন্যূনতম মজুরি। তারপর সেই শ্রমিক নিজের দক্ষতা-যোগ্যতায় অনেক দূর যেতে পারেন। সুশীল সমাজের যারা গার্মেন্টস শ্রমিকদের মজুরি নিয়ে গলা ফাটান, কলাম লেখেন, বিপ্লব করেন; তারা বুকে হাত দিয়ে বলুন তো আপনার প্রতিষ্ঠানে একজন কর্মীর স্টার্টিং স্যালারি কতো? বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করা গ্র্যাজুয়েটদের ১৫/২০ হাজার বেতন দিলে পাওয়া যায়। আমাদের গণমাধ্যমের স্টার্টিং স্যালারি কতো? একজন এমবিবিএস ডাক্তারকে আমাদের বেসরকারি ক্লিনিকগুলো শুরুতে কতো বেতন দেয়? প্রশ্নের উত্তরগুলো নিজেই নিজেকে দেবেন। গার্মেন্টস শ্রমিকদের উস্কে দিতে পারলে এই খাতে অস্থিরতা তৈরি করা যায়। অর্থনীতিকে আরো ঝুঁকিতে ফেলা যায়। পুঁজিবাদের ধারক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে এখন শ্রমিকদের দাবি আদায়ে সোচ্চার, বাংলাদেশের একজন গার্মেন্টস শ্রমিকের মজুরি কিন্তু ১০০ ডলারের আশেপাশে। এটা দেখে তারা দামটা একটু বাড়িয়ে দিক। গার্মেন্টস মালিকদের বলবো, মজুরি বাড়িয়ে দিতে। সমস্যার দুই পিঠই দেখতে হবে।

সমস্যা শুধু গার্মেন্টস খাতে নয়, আমাদের সব খাতেই রয়েছে। আমাদের মানুষ বেশি। তাই মজুরি কম। এ কারণেই বাড়তি আয়ের আশায় পরিবার-পরিজন ফেলে বিভিন্ন দেশে ছুটে যায়। আমাদের দেশে শ্রম সস্তা। তবে সেটা কতটা সস্তা হওয়া উচিত। মানুষের তো খেয়েপরে বেঁচে থাকতে হবে। পাঁচ বছর পর যে ৫৬ শতাংশ বাড়ানোর দাবি করা হচ্ছে মূল্যস্ফীতি আগেই কেড়ে নিয়েছে তার অনেকটা। এখন বাড়ি ভাড়া বাড়বে। দেখা যাবে শ্রমিকদের মজুরি আসলে বাড়েনি, কমে গেছে। শ্রমিকের রক্ত শোষণ করে গার্মেন্টস কেন কোনো খাতেই টেকসই উন্নয়ন ও বিকাশ সম্ভব নয়। উন্নয়ন অনেক হয়েছে। এখন তা টেকসই ও মানবিক করতে হবে।